২

ইতিহাসের অসম গতি : Historical Lag—তাহার কারণ

বলিয়াছি, ইতিহাসের প্রথম পর্বে আদিবাসী জীবন একান্ত কোমবদ্ধ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কোম ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বৃহৎ জনে বিবর্তিত হইতে থাকে। সকল কোমই একই সঙ্গে একই সময়ে সভ্যতার অধিকার লাভ করে নাই; শতাব্দীর পর শতাব্দীতে অতি ধীরে ধীরে এক একটি কোম সভ্যতার অধিকার পাইয়াছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক একটি স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাহার ফলে বাঙলা দেশের সর্বত্র এবং সমগ্র বাঙালী জীবন ব্যাপিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির একই স্তর বা ক্রম বিস্তৃত নয়; এমন কি একই সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও নয়; আজও নয়, প্রাচীনকালেও ছিল না। সুবিস্তৃত বাঙালী সমাজের একটি অংশ যখন উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্যে নিরত, আর একটি অংশ হয়তো তখনো কাঠের ফলার লাঙলে বা হাত-খুরপির সাহায্যে পাহাড়ের ঢালু গাত্র ধাপে ধাপে কাটিয়া সেখানে ধানের চাষ করিতেছে। একটি অংশ যখন বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত, উচ্চশ্রেণীর ধাতব মুদ্রায় কেনাবেচায় অভ্যস্ত, তখন হয়তো আর একটি অংশে মুদ্রা প্রচলিতই নয়, দ্রব্য-বিনিময়ে কেনাবেচা চলিতেছে, অথবা খুব বড় জোর কড়ির সাহায্যে। একটি অংশে যখন ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের প্রচলন, উচ্চশ্রেণীর মনন ও কল্পনার প্রসার, আর একটি অংশে তখনও ভূতপ্রেতবাদ, যাদুশক্তিতে বিশ্বাস, গাছপূজা, পাথরপূজা প্রভৃতি নিরঙ্কুশভাবে চলিতেছে। অথবা, পাশাপাশি বাস করিবার দরুন, একই সমন্বিত সমাজে বাস করিবার দরুন, একই সঙ্গে উন্নত ও আদিম কৃষি, ধাতব মুদ্রা ও বিনিময়ে কেনাবেচা, স্বর্ণমুদ্রা ও কড়ি, ব্রহ্মবাদ ও ম্যাজিক এমন অব্যাহত ও সহজভাবে চলিতেছে যেন ইহাদের মধ্যে বিরোধ কোথাও কিছু নাই। আজও যেমন প্রাচীন বাঙলায়ও তেমনই ছিল, বরং আরও বেশিই ছিল। ইহার কারণ খুব সহজবোধ্য। তবু, তাহা একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা যাইতে পারে, কারণ আমাদের সমাজে এই চেতনা আজও খুব সজাগ নয়।

আজিকার ভারতবর্ষে যে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দৃষ্টিগোচর তাহার ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায়, এই সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন স্তরে প্রাক্-আর্য ও অনার্য, কিছু কিছু বৈদেশিক নরগোষ্ঠীর সমাজ ও ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস বা আত্মসাৎ করিয়া করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে; আজও তাহার বিরাম নাই। যে প্রাক্-আর্য বা অনার্য কোম যে সভ্যতা বা সংস্কৃতি-স্তরের সেই অনুযায়ী বৃহত্তর হিন্দুসমাজে তাহার স্থান নির্ণীত হইয়াছে, এবং নানা বিধি-বিধান দ্বারা সেই স্থানটিকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা সজ্ঞানে সচেতনভাবে পারিপার্শ্বিকের সুযোগ-সুবিধা লইয়া, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও আবর্তের সাহায্য লইয়া সেই সব বিধি-বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহত্তর সমাজে স্থান লইতে পারিয়াছে তাহারা ক্রমশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর তাহার সুযোগ-সুবিধা খুব বেশি ছিল না; বিধি-বিধানের প্রাচীর ছিল সুদৃঢ়। তাহার ফলে বৃহৎ হিন্দুসমাজ ও ধর্মের, সভ্যতা সংস্কৃতির ভিতর নানা স্তর, নানা আকৃতি-প্রকৃতি নানা রূপ, নানা বৈচিত্র্য কিন্তু সব কিছুই একটা বৃহত্তর সীমার মধ্যে একীকৃত ও বহুলাংশে সমন্বিত।

বাঙলাদেশ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে, বরং আর্যস্থানবহির্ভূত পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া একটু বেশিই বলা চলে। প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী জীবনের সর্বত্র ইতিহাসের রথচক্র সমান গতিতে চলে নাই; ভূমিও তো সমতল নয়। তাহার ফলে আমাদের সমাজের ও জীবনের নানা স্থানে নানা অসমতা, অসংগতি; কোথাও গতি একেবারে স্তব্ধ ও নিরন্ত, কোথাও খুব দ্রুত ও চঞ্চল, কোথাও আমরা চলিয়াছি সাম্প্রতিক প্রাগ্রসর পৃথিবীর সঙ্গে সমতালে, কোথাও পড়িয়া আছি প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার মধ্যে! নানা স্তরের নানা অনুন্নত সমাজাংশকে সভ্যতা ও

সংস্কৃতির একই স্তরে আনিয়া সমতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইতিহাসের গতিকে সহজ, সুসম ও সরল করিয়া দিবার কোনও বৈপ্লবিক চেষ্টা প্রাচীন বাঙলায় হয় নাই; আজ অবধি হয় নাই; এবং সেই জন্যই আজও অবনত বা অনুন্নত বর্ণ, শ্রেণী ও সংস্কৃতি-স্তর আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। ভালো মন্দর কথা নয়, ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটে নাই, তাহাই বলিতেছি।

তবে, অবান্তর হইলেও এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলা উচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়। ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় সর্বত্রই সভ্য, সংস্কৃতিপূত মানবগোষ্ঠী চেষ্টা করিয়াছে বৃহৎ অনুন্নত আদিম মানবসমাজকে নানাপ্রকারে শোষণ ও পেষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে, অথবা একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টা কখনও হয় নাই, এ-কথা মোটামুটি নিঃসংশয়ে বলা চলে; তবে, কখনও কখনও কোথাও কোথাও হয় নাই, অবশ্য এমন বলা যায় না। বাঙলাদেশ ভারতের পূর্বপ্রত্যন্ত দেশগুলির অন্যতম, এবং এদেশে আদিবাসী কৌমসমাজের প্রতাপ এবং প্রাবল্যও ছিল বেশি। কাজেই, এদেশে মধ্যভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধন কখনও আদিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই, ব্যাপকভাবে সে-চেষ্টাও কেহ করে নাই। যত নিম্নেই হোক, বিধি-বিধানের বাধা-নিষেধের যত সুদৃঢ় প্রাচীর গড়িয়াই হোক, হিন্দুসমাজ নিজের বৃহৎ সীমার মধ্যে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহাকে ধারণ ও পোষণ করিয়াছে; তাহার ফলে একটা বৃহৎ সমন্বয়ও গড়িয়া তুলিয়াছে, যত ধীরে ধীরেই হোক যত অসম গতিতেই হোক।

তবু, স্বীকার করিতেই হয়,

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে ফেলিছে যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে॥

কবি তো এখানে ইতিহাসের যুক্তির কথাই বলিতেছেন। সভ্যতা সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে লইয়া যে বাঙালী-সমাজ, সে-সমাজের নিম্ন ও পশ্চাতের স্তরগুলি যে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর স্তরকে নিম্নে ও পশ্চাতে টানিতেছে— প্রাচীন কালে এবং মধ্যযুগে টানিয়াছে, আজও টানিতেছে। এই শ্লথ, উপলব্যথিত গতি ইতিহাসের রথকে সম ও দ্রুততালে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, সমাজদেহকে পঙ্গু ও রুগ্ন করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের এই অসম গতি পুষ্ট ও লালিত হইয়াছে প্রাচীন বাঙালীর বর্ণ ও শ্রেণী-বিন্যাসের সহায়তায়। আমাদের প্রাচীন বর্ণ-বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, উহার বিভিন্ন স্তর নির্ণীত হইয়াছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী, বৃত্তির স্তরচেতনা, অর্থাৎ উচ্চনীচ ভাবানুযায়ী। এই স্তরগুলি প্রত্যেকটি নানা বিধি-বিধান, বাধা-নিষেধের বেড়ায় ঘেরা; সে-বেড়া ডিঙাইয়া উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ; তাহার সঙ্গে আবার শ্রেণী-চেতনাও জড়িত। শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারের তারতম্যও আবার নির্ভর করিত এই বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী বিন্যাসের উপর। কাজেই একবার যাহার স্থান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনও একটা বিশেষ স্তরে নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার স্থান ছাড়িয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই; ইতিহাসও সেখানে স্তব্ধ ও নিরস্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রেণীবিন্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রাচীন বাঙলায় তথা ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রেণীচেতনার চেয়ে বর্ণচেতনা কৌমচেতনা ছিল প্রবল। আর, শ্রেণীর সঙ্গে তো বর্ণ ও বৃত্তি অঙ্গাঙ্গী জড়িতই ছিল। বর্ণ ও বৃত্তি যেখানে অনেকাংশে জন্মগত সে-ক্ষেত্রে শ্রেণীও কতকাংশে অচল, অনড় হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সক্রিয় বিরোধ এই অনড়, অচল অবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বর্ণ ও বৃত্তিগত বাধা-নিষেধের প্রাচীর কিছুটা ধ্বসাইতে পারিত, সেই সক্রিয় বিরোধের কোনও প্রমাণ, এমন কি সে-সম্বন্ধে সজ্ঞান চেতনার সাক্ষ্যও প্রাচীন বাঙলায় কিছু উপস্থিত নাই। যখন যে-শ্রেণী সামাজিক ধন যে-পরিমাণে বেশি উৎপাদন করিরয়াছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেই পরিমাণে তাহারা প্রভাব অর্জন ও বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই, সে-ক্ষেত্রে তাহারা স্বীকৃতিও

লাভ করে নাই। আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব সত্ত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও ভাবনা-কল্পনার ক্ষেত্রে তাহারা নিম্নে ও পশ্চাতেই থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, সেই স্থান তাহাদের বর্ণ ও বৃত্তিদ্বারা নির্দিষ্ট।

বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণীগত যে-সব বাধা ইতিহাসের গতিকে শ্লথ বা নিরস্ত করিয়াছে সে-সব বাধার প্রাচীর কিছুটা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতির উন্নত পরিবর্তন কিছু ঘটিত। আদিম কৌম জীবন ও সমাজের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল উন্নতর কৃষি ও উন্নতর শিল্পের প্রবর্তনে। তারপর যে বৃহত্তর জীবন ও সমাজের পত্তন হইল তাহারও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের প্রাচীন কৃষি ও শিল্পের উন্নততর বিবর্তন কিছু ঘটিত। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। মাঝখানে কয়েকটি সুদীর্ঘ শতাব্দী বাঙলাদেশ ব্যাবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া একটা বৃহত্তর জীবনের আস্বাদন লাভ করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিছু বাধাবন্ধন তাহাতে কাটিয়াছিল, ইতিহাসের গতিও কিছুটা বেগ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ব্যাবসা-বাণিজ্য যাঁহারা করিতেন তাঁহারা সাধারণত বৃত্তি ও বর্ণ সীমাকে স্বীকার করিয়াই করিতেন। তাঁহাদের শ্রেণীচেতনা ছিল বর্ণ ও বৃত্তিচেতনার অধীন। কাজেই জীবন ও সমাজের মৌলিক পরিবর্তন তাহাতে কিছু হয় নাই এবং সমাজ-প্রবাহের এখানে ওখানে নিরুদ্ধ জলাশয়, বদ্ধস্রোত খালবিল প্রভৃতি থাকিয়াই গিয়াছে।